"গীতারত্ন" শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ প্রবর্তিত ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকা (৬৪ তম বর্ষ)

পার্থসারথি

(মুদ্রিত সংখ্যা : জুন, ১৯৬০ থেকে মার্চ, ২০২০ / অন্তর্জাল সংখ্যা : এপ্রিল, ২০২০ থেকে)

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৫০তম অন্তর্জাল সংখ্যা

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ / 24.05.2024

:- সম্পাদক -:

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি-কণা	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
সকল বিপদে মায়ের কৃপা সহায়	শ্রীঅরবিন্দ
মহাভারতের উপাখ্যান	ভস্মলোচন
শ্রীচৈতন্য ও ধর্মসমন্বয়	ডাঃ রুহিদাস সাহা
ভোপাল থেকে একটু দূরে – সাঁচী ও ভীমবেটকা	শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য
বিকিরণের পরে	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine, RNI 5158/ 60, published in print format for sixty years, then converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and now being published through the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: (+91) 8910977590.

DO NOT COPY

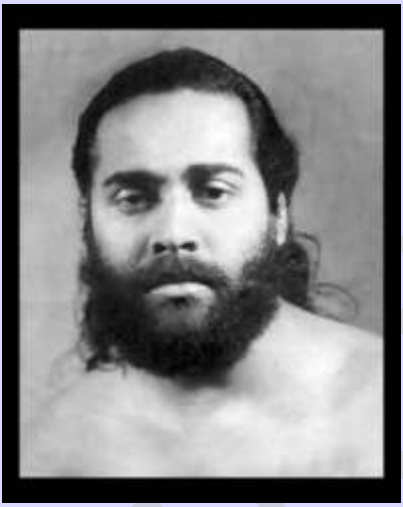

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

প্রীতি-কণা

"ঈশ্বর আমাদের সকলের মধ্যেই রয়েছেন, তা জ্ঞানে হোক বা অজ্ঞানে হোক। আমাদের মধ্যে অবস্থিত এই ঈশ্বরের জন্যই যেমন আমরা জীবনধারণ করি, তেমনই কর্মও সম্পাদন করতে পারি – সর্বদা এই উপলব্ধি হৃদয়ে পোষণ করতে পারলে অহং থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। ঈশ্বরে শরণ নিতে হবে, আমাদের মন প্রাণ ইন্দ্রিয় হৃদয় বুদ্ধি ইচ্ছা ও কর্ম নিয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হতে হবে। তাহলে তখন আমাদের ভিতর ভাগবত প্রেম ও জ্যোতি নেমে আসবে।"

DO NOT COPY

মা চলে গেলেন গত ২৪শে জুলাই, ১৯৯১, বুধবার। যে মায়ের জন্য তাঁর ছেলেরা ব্যাকুল হয়ে উঠতো, সেই মা গেলেন R.G. Kar Medical College & Hospital-এর General Bed-এ নীরবে নিভৃতে।

শনিবার যখন মা-কে দেখলাম, তখন তিনি জীবন্মৃত। জ্ঞান নেই। আগের দিন 'মা' বলে ডাকতে চোখ বন্ধ করে জিজ্ঞেস করেছিলেন – 'কেডা?' আমার নাম শুনে ভীষণভাবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন। বললেন, "বস।" পরদিন তাঁর Special Treatment শুরু হয়ে যাবার ফলে অজ্ঞান। আর জ্ঞান ফেরেনি। কখন গেছেন কেউ জানে না। কি বলতে চেয়েছিলেন, কেউ জানে না। কি দেখতে চেয়েছিলেন, কেউ জানে না। কি মনে হল শনিবার প্রণাম করে এলাম। নাগেরবাজারে রথের জন্য রবিবার যাওয়া সম্ভব হত না। কেন প্রণাম করলাম তাও জানিনা। আমার মনে হয়েছিল – এই শেষ। অনিমা বলে উঠলো – 'Pulse ভালো। মাঝে মাঝে একবার 'Slip' করছে। কখন চলে যাবেন কেউ জানে না।' ওর পক্ষে বলা সম্ভব কারণ দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বছর ও এই সেবার কাজ করছে। অভিজ্ঞতা ওর অনেক বেশি। আমরা যে যতবার অনিমার through-তে R.G. Kar-এ গেছি, সুস্থভাবে ফিরে এসেছি। হয়তো এটা আমার সংস্কার। মা-ও বিগত বছরগুলোয় বারবার একই ভাবে বাড়ী ফিরে এসেছিলেন। এবার অনিমার কাছে পৌঁছবার আগে মা hospital-এ ভর্ত্তি হয়ে গেলেন। আর ফিরলেন না। শ্রীপ্রীতিকুমারের মা, তাই অনিমা নিজে থেকেই গিয়ে দেখে আসতো। রবিবারেও ছুটি থাকা সত্ত্বেও বাড়ী থেকে গিয়ে মা-কে দেখে এসেছিল, আমি যাব না জেনে। যেদিন Blood নিয়ে নতুন Treatment শুরু হল, অনিমা বলেছিল – "সর্বনাশ হয়ে গেল। খোঁচাখুঁচি করবার জন্য না জানি কি হয়।" তার কিছু বলবার ছিল না। আর বললেই বা কে শুনছে? স্বয়ং মন্ত্রীমশাই যখন ভালো করবার জন্য ব্যস্ত!

শ্রীপ্রীতিকুমার থাকতে আমাকে সঙ্গে নিয়ে নিয়মিত মা-কে দেখতে যেতেন। তাঁর অবর্তমানে একা যেতে আমার খারাপ লেগেছে। তাছাড়া আমার মনে হয়েছে

আমাকে দেখলে মায়ের সেই আদরের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মনে পড়ে যাবে। তাই যাইনি। শ্রীপ্রীতিকুমার প্রয়াত হবার পঞ্চম দিন থেকে যে দুর্দ্দশার সম্মুখীন হয়েছি আমরা তার বোঝা কাউকে চাপাতে হয়নি আমাকে। তাছাড়া এই প্রায় পাঁচ বছর যে সংগ্রাম আমি ও বাপী করে চলেছি তার ভাগীদারও করিনি কাউকে। একটি তিন মাসের শিশুকে নিয়ে যে সংগ্রাম শুরু করেছিলাম, আজও তা শেষ হয়নি। আমি আমার প্রারব্ধ বা কর্মফল হিসাবেই ধরে নিয়েছি। একটা কথা ঠিক, আমার ছেলের জন্য আমার গর্ব করা উচিৎ। সে Engineer হয়েছে। শিক্ষকতা করলে আমি আরও বেশি খুশী হতাম। সেটা সে করতে চায় নি, সেটা আমার দুর্ভাগ্য বলেই মানি। মামা, কাকা, কাকিমা, মাসীমা, পিসিমা সম্বন্ধে সে শ্রদ্ধাশীল। কারণ সে জানে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হলে সে এই বয়সেও মায়ের কাছে পার পাবে না। আমার পুত্তরের প্রতি অনুশাসন জারি করাই আছে – আমার জীবিতকালে মাথার উপর দিয়ে চলা চলবে না। যদি পছন্দ না হয় জায়গা দেখো। এ বাড়ীতে থেকে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতেই হবে। শ্রীপ্রীতিকুমার অসম্ভব disciplined ছিলেন। তাঁর চরিত্রে তাঁর মায়ের প্রভাব খুব বেশীই ছিল। কথায় কথায় বলতেন, "আমার মা আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছিলেন। আমার মা আমাকে নির্ভীক হতে সাহায্য করেছেন, ইত্যাদি।" মায়ের গল্প যখন শুরু করতেন আর শেষ হতে চাইতো না। শেষ বয়স পর্যন্ত মায়ের প্রতি আনুগত্য ছিল। শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। কোনও দিন মায়ের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে শুনিনি। অপছন্দ হলে চুপ করে থেকেছেন। বাপীকে শেষের দিকে বলেছিলেন, "মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে নেই। মা যদি খারাপও হয় তাকে অপমান করা যায় না।" – আমার ছেলে তার পিতার কথা মনে রাখে কিনা আমি জানি না, শুধু এটুকু জানি আমাকে অনেক দিন কাজ করতে হবে। আমি যা পেন্সনের টাকা পাবো তাতে আমার ভরণপোষণ হয়ে যাবে। আর শ্রীপ্রীতিকুমার আমাকে রীতিমতো বড়োসড়ো ছাদের তলায় রেখে গেছেন। তাছাড়া তাঁর ভক্তবৃন্দ, কাছের জনেরা তো আমাকে আগলেই আছেন। একটা মানুষের আর কত প্রয়োজন? একটা কাজ করতে চাইলে তো আর কেউ চুপ করে বসে থাকবে না!

দিন কেটে যায়। আমার সুদিন আসছে যখন ভাবছিলাম এই সময়েই শাড়ীর দাম, স্টীলের দাম, চিনির দাম, সর্বোপরি গ্যাসের দাম বেড়ে গেল। তখন মনে হল বৃহস্পতি সরে যাবার জন্য গোচরশুদ্ধি না থাকায় কন্যারাশির অবস্থা খারাপ যাবে। আমার বোধহয় তাই হল। আমার ছেলে কি beautifully আমার একটা Hand bag Auto-তে ফেলে এলো তা প্রকাশ করলে খুব দীর্ঘ হয়ে যাবে। হিসেব করলে ব্যাগটাই পঞ্চাশ টাকা, ছাতা নব্বই টাকা, থালা ষাট টাকা, চামচ ষোল টাকা, মগ সতেরো টাকা, গ্লাস নয় টাকা, পাখা ছয় টাকা, পাউডার চোদ্দ টাকা, কিছু ধূপকাঠি ছেষট্টি টাকা, একটা টিফিন ক্যারিয়ার প্রায় আড়াইশো টাকা, ওষুধ কুড়ি টাকা, ছোট ছোট জিনিস প্রায় দুশো টাকার – এইভাবে প্রায় এক হাজার টাকার গচ্চা গেলো। বৃহস্পতি সরবার জন্য আমার এই সর্বনাশটা হল। ছেলে তো শোকে কাতর। ওর মুখটা দেখে বুক ফেটে গেলো আমার। বললাম, "দুঃখ পাচ্ছিস কেন? আরও কত বিপদ হতে পারতো ! জীবনটাই থাকে না আর জিনিসের জন্য শোক?" ছেলের আড়ালে হেসে মরেছি। কেমন দার্শনিকের মত কথা বলতে শিখেছি! তাহলে কি আমার ধৈর্য্য বাড়ছে? ৩৪ বছর আগে শ্রীপ্রীতিকুমার আমার একটা বড় আটচল্লিশ ইঞ্চি মাপের স্যুটকেস ভিড় বাসে হারিয়ে ফেলেছিলেন। আমার কান্না দেখে বলেছিলেন, "এমন ভাব করছো যেন স্বামী বা সন্তান কেউ মারা গেছে।" ভাবলাম উত্তর দিই, "জানোনাতো বাপু, স্বামী সন্তানের চেয়ে দামী কত নতুন শাড়ী ও বিয়ের গয়না ছিলো স্যুটকেসটার মধ্যে।" ৩৪ বছর আগে যেসব জিনিসের জন্য মায়া হয়েছিল আজ আর সেসব জিনিসে আসক্তি নেই। ও থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি? কিন্তু শ্রীপ্রীতিকুমার না থাকাতে আমার সব নবাবী আহ্লাদীপানা চলে গেছে। ছোড়দিকে বলেছিলাম নিজের ছেলের চেয়ে পরের ছেলেই ভালো হয়। স্বামী তো পরের ছেলে। কত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, মান-অভিমানের দিকে নজর রাখেন। কিন্তু নিজের ছেলে? তার কোনও কথা বা কাজ পছন্দ না হলেই মুখ হাঁড়ি। আহারে অনিচ্ছে, বিহারে উদাস! ভাবি একবার বলি – "বাছা একবার চরে এসো। কত ধানে কত চাল, বাজার ঘুরে সেটা বুঝে এসো।"

এই বাসস্থানে আরেকটা বাঁশ হল পার্থসারথি। যে মাসে Salary দেরিতে পাই সেই মাসেই Press-এর কর্ত্তা বাড়ীতে লোক পাঠান টাকার জন্য। সময়মত দেওয়া উচিৎ স্বীকার করি, কিন্তু salary না পেলে কোথা থেকে দেবো? আমার তো একটা দাদা বা ছোড়দা নেই। এইসব জায়গায় এসে আমরা ব্যাতিব্যস্ত হই। অথচ ব্যাপারটা কিছুই না। যার টাকার দরকার সেই বা আমার কাছে দীর্ঘকাল টাকাটা ফেলে রাখবে কেনো? অবশ্য একজন টাকা পয়সার তাগাদা দেন না, তিনি বাসুদেব মান্না। যা ইচ্ছে আনিনা কেন হাসিমুখে গুছিয়ে দেবেন। কিন্তু বাড়ী এসে জামা গায়ে দিয়ে দেখব পড়পড় করে ছিঁড়ে যাচ্ছে। অথচ সে এমন জামা সামনে গিয়ে ফেলে দেবার নয়। আর একজন আছেন, এখানকার বড়দা। যাই চাই, বলে আরও দেবো? আরও দেবো? গত দুবার আমি বেশী জিনিসটা সোজা ফেরৎ পাঠাতে আর বেশী জিনিস বাড়ী আসেনি।

আরেকজন আছেন, আমার কাগজওয়ালা। পৃথিবীর সমস্ত কাগজ আমাকে ভালোবেসে পড়বার জন্য দিয়ে যান। মাসের শেষে যখন Bill দিয়ে যান, আমার চিন্তা করতে হয় অত টাকা আমি Draw করতে পারি কিনা!

Recently আমার একটা ত্রুটি দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যা-আহ্নিকে আমার ঠিক মনোযোগ নেই। সাতজন শিব ও শিবলিঙ্গ নিয়ে আমি কাহিল! ওরা যদি দম দেওয়া রথে বসতে পারতেন, আমি দম দিয়ে দেখতাম তাঁরা কতদুর যেতে পারেন! আজকাল সোজা তাঁদের একসাথে হুড়হুড় করে মাথায় গঙ্গাজল দিয়ে, ইদং স্নানীয় গঙ্গোদকং ... করে কর্তব্য করি। এমন কেন হল জানি না। হয়তো সংস্কার থেকে বেরিয়ে পড়বার সূচনা। সত্যি বড়ো বেশী সময় যাচ্ছিল। শ্রীপ্রীতিকুমার বলেছিলেন, "তোমার কোনও পুজো করবার দরকার নেই। আমি যা করেছি তাতে সাতপুরুষের পুজো করতে হবে না।" তখন শুনতাম। জীবনেও উপোষ করিনি, পুজো করিনি, কিন্তু এখন দেখছি আপনা আপনি ওদিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এটাও ঠিক, নাতি-নাতনীরা তাদের বাড়ি ফিরে এলে আর কোনও পূজাই করবো না। তখন তো আরও সময়

কমে যাবে। তারাই হবে আমার গৃহদেবতা। এবং আমি জানি শ্রীপ্রীতিকুমারই এই ব্যবস্থায় সবচেয়ে সুখী হবেন।

- - - - - - - - -

(** রচনাকাল – আগস্ট, ১৯৯১)

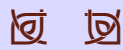

সকল বিপদে মায়ের কৃপা সহায় **শ্রীঅরবিন্দ**

জয় সুনিশ্চিত

এই কথাটি নিশ্চিত জেনে রেখো যে এ-পথে চলতে আগাগোড়াই মা তোমার সঙ্গে থাকবেন। বিপদ-আপদ কতই আসে আবার কতই যায়, কিন্তু মা যখন রইলেন সঙ্গে, তখন জয় তোমার সুনিশ্চিত। ১৮-০৭-১৯৩৬

মা এ-পথের সঙ্গী

ও ঠিক কথা নয়। সম্ভবত তোমার প্রাণসত্তা বা তোমার দেহ-চেতনার কোন অংশ জিনিসটাকে ঐ-ভাবে চিত্রিত করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ-পথ মরুভূমির পথও নয় আর তুমিও এতে নিঃসঙ্গ যাত্রী নও, কারণ মা রয়েছেন তোমার সঙ্গী।

০২-১১-১৯৩৩

মায়ের কৃপার কাজ

প্রশ্ন : এই কি আমি নিশ্চয় বলে ধরে নিতে পারি যে এখনও যদিও আমার বিপদ কাটলো না তবু মায়ের কৃপা নিজের কাজ করে চলেছে?

উত্তর : তা যদি না হ'ত তাহলে প্রত্যেকেই এ-কথা বলতে পারত, "কৃপা যখন মিলেছে তখন আমার সমস্ত বিপদ এখনই ঘুচে যাক, সকল বাধা থেমে গিয়ে

DO NOT COPY

এখনই আমার সিদ্ধিলাভ হয়ে যাক, নইলে বুঝবো যে আমার উপর মায়ের কৃপাই হয়নি।”

২০-০৭-১৯৩৩

চৈত্য বিকাশ ও মায়ের কৃপা

প্রশ্ন : কিসে মায়ের কৃপা সার্থকভাবে কাজ করে?

উত্তর : চৈত্যের বিকাশ যতই হতে থাকবে, মায়ের কৃপায় সার্থকভাবে ততই কাজ করবার সম্ভাবনা বাড়তে থাকবে।

১৩-০৮-১৯৩৩

বিপদে মায়ের শক্তি-কে আহ্বান

(১)

বিপদ যখন আসবে, তখন ভিতরের দিকে অচঞ্চল থেকে সে-বিপদ কাটিয়ে দেবার জন্য মায়ের শক্তিকে আহবান করবে।

২৬-০৮-১৯৩৩

(২)

নিজের ইচ্ছাশক্তিকে যখন প্রয়োগ করতে পারছ না তখনকার পক্ষে একটি মাত্র উপায় আছে – মায়ের শক্তিকে ডাকতে থাকা; এমন কি শুধু মনেরই দ্বারা কিম্বা মনের উচ্চারিত ভাষা দিয়েই ডাকতে থাক, বিপদের আক্রমণে নিতান্ত মুষড়ে গিয়ে তার কাছে হার মানার চেয়ে সেও অনেক ভাল, কারণ শুধু এমন ভাবে মনের ডাকে যদিও তখনই সাড়া মিলবে না, কিন্তু ওতে শেষ পর্যন্ত মায়ের শক্তি নেমে এসে অন্ততপক্ষে তোমার আভ্যন্তরীণ চেতনাকে আবার উন্মুক্ত করে দিতে পারবে। আর আসলে সব কিছু এরই উপর নির্ভর করছে। বহির্মুখ চেতনাতে একটা অন্ধকার ঘোরালো অবস্থা ও কষ্টকর নিপীড়নের ভাব সব সময়েই থাকতে পারে; কিন্তু অন্তর্মুখ চেতনা যতই তার অধিকার বিস্তার করতে থাকে, ততই সে এ-সব জিনিসকে ঠেলে বাইরের দিকে বের করে দেয়, আর সেই চেতনাই যখন সর্বত্র পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন আর ওগুলি মোটে থাকেই না – যদি বা ক্বচিৎ এসে পড়ে, সে কেবল একটা বাইরের ছোঁয়া লাগার মত, সত্তার ভিতর দিকে ঢুকতেই পারে না।

২১-০৮-১৯৩৩

DO NOT COPY

(৩)

"মাকে আমি ভাল করে ডাকতেই পারি না, - যথার্থ আস্পৃহা বলতে আমার কিছুই আসেনা", ইত্যাদি – এগুলি তোমার অবচেতন স্থূল সত্তার একটা মোহাবিষ্ট ভাবের কথা, অভ্যাসের ক্রিয়াতে ঐ একই রকমের চিন্তার পুনরুক্তি সেখান থেকে বারেবারে বেরিয়ে আসছে; ঐ হতাশার ভাবটি, আর তারই পরিপোষক যত কিছু স্মৃতি ইত্যাদি সবই সেখানকার আমদানি। এ-সব একঘেয়ে ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়ে কিছু লাভ নেই। তুমি মাকে যা বলছ ভাল করে ডাকো, তেমন ভাবে যদি মাকে নাও ডাকতে পার, তবু যেভাবে পারবে সেই ভাবেই ডাকবে – আর তাও যদি না পার, তাহলে শুধু এই কামনা নিয়ে তাঁকে স্মরণ করতে থাক যেন তোমার মধ্যে এ-সব জিনিস আর না থাকে। যথার্থ আস্পৃহা তোমার এসেছে কি আসেনি এই চিন্তা নিয়ে নিজেকে পীড়ন করতে থেকো না – তোমার ভিতরের চৈত্যপুরুষ যখন মাকে চাইছে তখন তাই যথেষ্ট। বাকি আর যা কিছু হবার তা ক্রমশ তাঁর কৃপার দ্বারাই হবে, তবে তোমাকে অবিচল চিত্তে সেই কৃপার ঊপর একান্ত নির্ভর করে থাকতে হবে – কারণ প্রকৃতপক্ষে নিজের ক্ষমতা বা নিজের গুণ বা নিজের কৃতিত্বের দ্বারা প্রকৃত উপলব্ধি কারোই কখনও মেলে না।

যাই হোক, তোমার এই মোহাবিষ্ট ভাবকে দূর করে দিতে আমার নিজের তরফের শক্তিকে নিশ্চয়ই প্রয়োগ করব, কিন্তু তোমার ঐ অভ্যাসগত চিন্তাগুলিকে যদি ছাড়তে পার, তাহলে এমন আক্রমণকে নিবারণ করা তোমার পক্ষে আরো সহজ হবে।

০৪-০১-১৯৩৭

(৪)

"আমি কিছু পারছি না, আমার কিছু হচ্ছে না," এই জাতীয় চিন্তা বা ধারণা এসে যেন তোমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করতে না পারে ; ওগুলি কেবল তামসিকতার কুমন্ত্রণার কথা, ওতে এসে পড়ে একটা হতাশার ভাব, আর হতাশা এসে দেখা দিলেই তার থেকে যত বিরোধী শক্তির আক্রমণ করবার পথ প্রশস্ত হয়ে যায়। ঐ কথাগুলি বলার বদলে তুমি বরং এই ধরণের মনোভাবকে আঁকড়ে ধরবে, "আমার সাধ্যে

যেটুকু কুলোয় সেইটুকুই আমি করে যাই; তারপরে ভগবান তো রয়েছেন, মায়ের নিজের শক্তি তো রয়েছে, সময় হলে আর যা হবার তা ঐদিক থেকেই হবে।"

০৪-১১-১৯৩৫

(৫)

কিছুতেই বিচলিত না হয়ে অচঞ্চল চিত্তে নিজের আস্পৃহাকে ধরে রাখা, এই হল উপযুক্ত মনোভাব, কিন্তু মায়ের সাহায্যও নেওয়া চাই, তাঁর সাহায্যের দান চাইতে এবং গ্রহণ করতে কিছুতেই যেন বিমুখ হয়ো না। নিজের দিক থেকে একটা অপারগতা বোধ করা, যথোচিত ভাবে সাড়া দিতে পারছি না বলে মনে করা, নিজের যত ত্রুটি ও অক্ষমতা নিয়ে অনবরত ভাবতে থাকা, আর তাই নিয়েই মনকে লাঞ্ছনা দিয়ে ক্লিষ্ট করতে থাকা, এগুলি কারও পক্ষেই উচিৎ নয়; কারণ এই সব ধারণা ও মনোভাবকে প্রশ্রয় দিলে তার থেকে শেষ পর্য্যন্ত একটা স্থায়ী রকমের দুর্বলতা এসে পড়ে। যদিই বা দেখা দেয় বিঘ্ন-বিপত্তি, বিফলতা, ব্যর্থতা, পরাজয়, তবু তাকে দেখতে হবে অচঞ্চল দৃষ্টিতে, আর সে অবস্থা ঘুচিয়ে দেবার জন্য নিরন্তর আহ্বান করতে হবে ভগবানের সাহায্য। তখন তাঁর দিকেই শুধু চেয়ে থাকবে, কিন্তু নিজে কিছুতেই ধৈর্য্যহারা বা নিরুদ্যম বা ক্লিষ্ট হয়ে পড়লে চলবে না। যোগের পথ নিতান্ত সহজ নয়, আর প্রকৃতির সমূহ পরিবর্তন আনাও একদিনে সম্ভব নয়।

আক্রমণকালে মায়ের দিকে উন্মীলন

প্রতিকূল আক্রমণ যতই প্রচণ্ডভাবে আসুক, আর তাতে যদি সাময়িকভাবে তোমাকে একেবারে পেড়েও ফেলে, তবু যদি তুমি তখন মায়ের দিকে উন্মীলিত হয়ে থাকার অভ্যাস করে রাখতে পার, তবে দেখবে যে সে বিপদ শীঘ্রই কেটে যাবে। নিজে যদি তখন স্থির চিত্তে থাকতে পার আর মায়ের শান্তি ও শক্তির দিকে নিজেকে উন্মীলিত রাখতে পার, তাহলে তোমার মধ্যেও শীঘ্রই আবার শান্তি ফিরে আসবে। একবার যখন সত্যের সামান্য কিছুও তোমার মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে, তখন যদিও তা কিছুকালের জন্য ভ্রান্ত ক্রিয়ার ফলে ঘন মেঘে আবৃত হয়ে যায়, তবু তার পরে আবার তা আকাশের মেঘমুক্ত সূর্যের মত নিশ্চয়ই জাজ্জ্বল্যমান হয়ে উঠবে। তাই

বলছি অটুট বিশ্বাস নিয়ে অধ্যবসায়ের সঙ্গে লেগে থাক, ধৈর্যটুকু কিছুতেই হারিয়ো না। ১৪-০৩-১৯৩২

মায়ের শক্তিক্রিয়াতে বিশ্বাস

কেবল চাই অধ্যবসায় – নিরুৎসাহ না হয়ে বরাবর সাধনায় লেগে থাকবে, এটা নিশ্চিত জেনে রাখবে যে প্রকৃতির নিয়ম আর মায়ের শক্তির অমোঘ ক্রিয়া সকল বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়ে ঠিকই অগ্রসর হয়ে চলেছে, তার যা ফলাফল তা নিশ্চয়ই ফলে যাবে। আমাদের নিজেদের অক্ষমতায় কিছুই যায় আসে না – মানুষের মধ্যে এমন কেউ-ই নেই যার প্রকৃতির কোন অংশেই কিছু অক্ষমতা নেই - কিন্তু তবু সকলের উপরে রয়েছে ভগবানের দিব্য শক্তি। তারই উপর তোমার বিশ্বাসকে যদি অটুট রাখতে পারো, তবে ঐ অক্ষমতাই রূপান্তরিত হয়ে আসবে সক্ষমতায় । এই সব দুঃখকষ্ট ও বিপত্তিগুলিই তখন সাফল্য আনবার উপায়স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে।

২৭-০৫-১৯৩৬

সকল অবস্থাতেই একমাত্র করণীয়

কেউ যখন একবার এই যোগের পথে পা দিয়েছে, তখন তার পক্ষে একমাত্র কাজ হবে এই যে, বাধাবিপত্তি যা কিছুই আসুক কিম্বা যখন যা কিছুই ঘটুক, তবু এর শেষ পর্যন্ত আমাকে যেতেই হবে এই স্থির সংকল্পটি নিয়ে থাকা। যোগের সাধনাতে প্রকৃতপক্ষে কেউই তার নিজের ক্ষমতায় সিদ্ধিলাভ করেনা - যে বৃহত্তর শক্তি রয়েছে তোমার মাথার উপর দিকে, সেই নিয়ে আসে সিদ্ধি – আর যখন তুমি সকল রকমের অবস্থা-বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে অনবরত কেবল তাঁকেই ডাকতে থাকবে তখনই সে আসবে। যদি ঠিক ভাবের আস্পৃহা জিনিসটা তুমি নাও আনতে পার, তবু মায়ের সাহায্য পাবার আশায় তুমি কেবল একান্তভাবে তাঁর দিকেই ফিরে থাকো – তোমার পক্ষে সকল অবস্থাতেই এই একমাত্র করণীয়। ০৩-০১-১৯৩৪

আসল কাজ

সর্বদাই মাকে ডাকা, এই হল আসল কাজ, - এবং তার সঙ্গে নিত্য একটা আস্পৃহা নিয়ে থাকা, আলো যখন আসছে তখন তাকে সাদরে গ্রহণ করা, আর কামনা প্রভৃতি সব কিছু অজ্ঞানতার ক্রিয়াকে কোন আমল না দিয়ে নিজেকে তার থেকে তফাৎ করে রাখা। কিন্তু যদি তুমি এইসব আনুসঙ্গিক জিনিসগুলি ঠিকভাবে নাও করতে পারো, তবে শুধুই তাঁকে ডাকতে থাকো, কেবল ডাকো আর ডাকো, বারেবারেই ডাকো।

মায়ের সক্রিয় শক্তি তোমার সাথে সাথে রয়েছে, এমনকি যখন তুমি জানতে পারছো না তখনও; অতএব নিশ্চিন্ত হয়ে থাক আর অধ্যবসায় ছেড়ো না।

১৫-০৯-১৯৩৫

মায়ের নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা

মায়ের সাহায্য সর্বক্ষণই রয়েছে, কিন্তু তা সর্বক্ষণই তুমি জানতে পার না, কেবল চৈত্যপুরুষ যখন সজাগ থাকে আর চেতনা থাকে মেঘমুক্ত, সেই সময়টুকু ছাড়া। কুমন্ত্রণার কথা ভিতরে এসে ঢুকছে বলেই তার থেকে প্রমাণ হয় না যে মায়ের সাহায্য সেখানে নেই, এমন কুমন্ত্রণা সকলের মধ্যেই আসে, এমন কি মহা মহা সাধকদের কিম্বা অবতারদের মধ্যেও – যেমন বুদ্ধের বা খ্রীষ্টের বেলাতেও তা বাদ যায় নি। দোষ ত্রুটি তো থাকবেই – ওগুলি প্রকৃতিরই অংশ, আর ঐগুলিকেই জয় করতে হবে। তোমাকে সেই ক্ষমতাই অর্জন করতে হবে যাতে তুমি ঐসব কুমন্ত্রণাকে নিজের মধ্যে স্বীকার করে না নাও, তাকে সত্য জিনিস বলে বা তোমার নিজেরই চিন্তার গড়া জিনিস বলে মেনে না নাও, সে যে বাস্তবিক কোন জিনিস তা নিজের চোখে দেখে নিয়ে নিজেকে তার থেকে তফাৎ করে রাখ। ঐ সব দোষ ত্রুটিকে এই বলে জানতে হবে যে মানব-প্রকৃতির যন্ত্ররূপী আধারে কতকগুলি ভুল জিনিস এসে পড়েছে যাকে বদল করে নেওয়া দরকার – তা পাপ কিম্বা মন্দ কিছু বলে মনে করা ঠিক নয়, কারণ ওতে মানুষকে তার নিজের সম্বন্ধে ও নিজের সাধনা সম্বন্ধে হতাশ করে দেয়।

মায়ের দিকের সাহায্য ও প্রাণের দিকের পরিবর্তনে সম্মতি

যে-কেউ মায়ের সাহায্য চাইবে, তার জন্য সে সাহায্য সর্বদাই হাজির রয়েছে। কিন্তু তোমার প্রাণ-প্রকৃতির এ বিষয়ে সচেতন হওয়া চাই, পরিবর্তন এনে দেবার পক্ষে তার নিজের সম্মতি থাকা চাই। কেবল এটুকু লক্ষ্য করলেই চলবে না যে অমন পরিবর্তনে সে রাজী হচ্ছে না, আর তার উপরে জোর করতে গেলেই সে তোমার মধ্যে একটা দারুণ অবসাদ এনে দিচ্ছে। প্রথম দিকে প্রাণ-প্রকৃতি ওতে কোনো মতেই রাজী হয় না, তাকে বদলাতে চাইলে বা ঐদিক দিয়ে জোর করতে গেলে সে বিদ্রোহ বা অবাধ্যতার দ্বারা চিরকালই এমনি অবসাদ আনে। কিন্তু তবু তোমাকে অনবরত এই কাজে লেগে থাকতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সত্য কথাটাকে নিজেই মেনে নিতে বাধ্য হয় , আর রূপান্তর আদতে ও সে বিষয়ে মায়ের সাহায্য এবং কৃপা চাইতে নিজেই রাজী না হয়। মনের দিকটা যদি থাকে খাঁটি আর চৈত্য আস্পৃহা যদি হয় অকপট ও ঐকান্তিক, তাহলে প্রাণসত্তাকে এ পরিবর্তনে বাধ্য হতেই হবে। ১৫-০৭-১৯৩২

অকপট সারল্য ও মায়ের সহায়তা

যারা অকপট নয় তাদের পক্ষে মায়ের সাহায্য কোন কাজের হয় না, কারণ তারা নিজেরাই সে সাহায্যকে প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেরা না বদলাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এমন প্রত্যাশা করতে পারে না যে তাদের সেই নিম্নতর প্রাণসত্তা ও স্থূল ভাবের প্রকৃতির মধ্যে অতিমানসের জ্যোতি ও সত্য এসে অবতরণ করবে; নিজেদের জমানো পঙ্কের মধ্যে তারা চিরদিন আবদ্ধ হয়ে থাকে, সেখান থেকে আর অগ্রসর হতে পারেনা। -- নভেম্বর, ১৯২৮

অনুবাদক : পশুপতি ভট্টাচার্য্য ***

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

**(শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সৌজন্যে)

DO NOT COPY

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ

"শাস্ত্রে তাঁকে পাবার উপায়ের কথা পাবে। কিন্তু খবর জেনে কর্ম আরম্ভ করতে হয়। তবে তো বস্তুলাভ।" - শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

মহাভারতের যেসব মূল ঘটনা, তাদের অনেকগুলোই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সাথে ক্রমপরম্পরাক্রমে জড়িত। কাজেই কী সামাজিক-কী রাজনৈতিক-কী ধর্মীয়, সবদিক থেকেই ব্যাপারটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণই বলতে হয়। এর সূত্রপাতের কথায় দেখা যায় - খাণ্ডবদহনে অর্জুনের কৃপায় মরতে মরতে বেঁচে গিয়ে, কৃতজ্ঞতার চিহ্নরূপে বানিয়ে দিয়েছিলেন ময়দানব যুধিষ্ঠিরের জন্য অতি বিচিত্র একটি সভাগৃহ, যা দেখেই সাধ জেগেছিল যুধিষ্ঠিরের মনে রাজসূয় যজ্ঞের। বিষয়ের সংস্পর্শে কেমন করে যে বিষয় তৃষ্ণা বেড়েই উঠতে থাকে, অন্যের আর কথা কি, স্বয়ং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বেলাতেও সে প্রমাণের অভাব দেখা যায় না! যুধিষ্ঠিরের মনের এই সাধ বা বাসনা-অঙ্কুর কেমন করে যে ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছিল এক বিশাল বিষবৃক্ষে, এই একটুখানি আগুনের ফুলকি কি করে যে একদিন কুরুকুল তথা সারা ভারতের ক্ষত্রিয় কুলকেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছিল-সে কথাটাই এবারে একটু স্মরণ করতে চেষ্টা করা যাক।

সভাগৃহ নির্মাণ শেষ হতেই, যথারীতি পূজার্চনার পরে ভাইদের নিয়ে প্রবেশ করলেন যুধিষ্ঠির সভামণ্ডপে। কেবল নিজের লোক বলতে যাদের বোঝায় তারাই নয়, বহু আর্য, অনার্য, ম্লেচ্ছ ও যবন রাজারা এবং সেই সাথে বড় বড় মুনিঋষিদেরও উপস্থিত হতে দেখা যায় এই উপলক্ষ্যে। সকলের শেষে আবির্ভাব হ'ল দেবর্ষি নারদেরও। এই প্রসঙ্গে নারদ সম্বন্ধে মহাভারতের যে বর্ণনা, তার সাথে তুলনা করলে বুঝতে দেরী হয় না, লোক প্রচলিত ধারণা বা পুরাণের কাহিনীতে এইসব ঋষি চরিত্রকে কতটা হালকা করে ফেলা হয়েছে। এই সভা পর্বেই বলতে শোনা যায় - তিনি (নারদ) সমস্ত বেদ, উপনিষদ, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। ইতিহাস ও পুরাণ সমূহ

তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তাঁহার মতো রাজনীতি এবং ধর্মনীতি পারদর্শী প্রায় দৃষ্ট হইত না; তিনি প্রগল্‌ভ, স্মৃতিমান, প্রমাণনিষ্ঠ কবি ও পুরাকল্প বিশেষবিদ ছিলেন। ষড়গুণ্য প্রয়োগে (অর্থাৎ সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, ভেদ ও আশ্রয় বিষয়ে) তাঁহার তুল্য কেহই ছিল না। তিনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ মেধাবী ও ন্যায়বান ছিলেন। শিষ্যমণ্ডলীকে কিরূপে জ্ঞানোপদেশ ও কার্য্যোপদেশ প্রদান করিতে হয়, তাহা তিনিই যথার্থ জানিতেন। বৃহস্পতি অপেক্ষাও তিনি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিতে পারিতেন; ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গ যথাবিধি সেবা করিয়াছিলেন। যোগবলে ত্রিলোক সর্বক্ষণই তাঁহার প্রত্যক্ষ হইত এবং তিনি অতীত কালকে বর্তমানের ন্যায় দেখিতে পাইতেন। প্রসঙ্গক্রমে যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাঁর যে সব প্রশ্ন, তাতেও প্রমাণ পাওয়া যায় নারদের বহুমুখী প্রতিভার - বুঝতে পারা যায় কেন আমাদের প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষা-নীতি-ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারদের আবির্ভাব - নারদের উপদেশ এত অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছিল। যুধিষ্ঠিরের এই যে রাজসূয়-যজ্ঞ, এতেও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায় না। তবে এই জাতীয় যজ্ঞের যে অবশ্যম্ভাবী কুফল তা জেনেও যখন যুধিষ্ঠিরের তরফে যজ্ঞের ইচ্ছা ত্যাগের কোনই লক্ষণ দেখা গেল না, তখন তাঁর নিজের বুদ্ধি বিবেচনার উপরেই গোটা ব্যাপারটাকে ছেড়ে দিয়ে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করে স্বস্থানে প্রস্থান করতে দেখা যায় পরম বুদ্ধিমান নারদকে। নারদ চলে যাবার পরে পরামর্শ করলেন যুধিষ্ঠির মন্ত্রীগণ, পুরোহিতগণ ও ভাইদের সাথে, যাঁরা সকলেই একবাক্যে মত দিলেন যজ্ঞের পক্ষে। কিন্তু তা সত্ত্বেও চলতে থাকে মনের দ্বন্দ্ব। মনে পড়ে যায় যুধিষ্ঠিরের কৃষ্ণের কথা। ব্রজগোপীদের মতো কৃষ্ণের প্রতি অহেতুক ভক্তির অধিকারী ছিলেন না বটে পাণ্ডবেরা, কিন্তু সম্পদে বিপদে দেখতেন তাঁরা তাঁকে-পিতেব পুত্রস্য, সখেব সখ্যুঃ রূপেই। যুধিষ্ঠিরের ডাকে ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হয়েই বুঝে নিলেন কৃষ্ণ - রাজসূয় যজ্ঞ না করলেই নয়! কিন্তু সরাসরি হাঁ, না কিছুই না বলে, বললেন তিনি যুধিষ্ঠিরকে - ‘হে মহারাজ! যদি আপনার রাজসূয় যজ্ঞ করিবার মানস থাকে তবে, অগ্রে জরাসন্ধ কর্তৃক বদ্ধ ভূপালগণের মোচন ও দুরাত্মা জরাসন্ধকে বধের নিমিত্ত যত্ন করুন; নচেৎ আপনি কোনক্রমেই

রাজসূয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন না। হে কুরুনন্দন! আমার এই মত। এক্ষণে আপনি বিবেচনা করিয়া যাহা উচিৎ হয় বলুন!' এই প্রসঙ্গে জরাসন্ধের জন্ম ও বলবিক্রম সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তাতে প্রশ্ন জাগে-অক্ষৌহিনী সেনার অধিপতি মহারাজ বৃহদ্রথের পুত্র এই যে পরম শিবভক্ত প্রবল প্রতাপ সম্রাট জরাসন্ধ, যাঁর জামাতা ছিলেন মথুরার রাজা কংস, আর দুর্জয় কালযবন ও মহারাজ শিশুপালাদি পরম মিত্র এবং মহাভারতের মতে যাঁর ভয়ে স্বয়ং কৃষ্ণকেও যাদবদের নিয়ে মথুরা ছেড়ে দ্বারকায় পালাতে হয়েছিল, তিনি কি বস্তুতঃ কোন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি? হলে কোন ঐতিহাসিক যুগে বা কালে তার উদ্ভব হয়েছিল? ইতিহাসের কথায় বলতে গেলে বলতে হয় - 'কালযবন' অর্থে এমন কোন একজন মহাশক্তিশালী গ্রীক রাজপুরুষকেই বোঝায় যিনি সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের পরে পরেই অথবা পরবর্তী কোন সময়ে ভারতের কোন এক অঞ্চলের রাজা বা শাসনকর্তা ছিলেন। এছাড়াও, এই রাজসূয় যজ্ঞে কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান উপলক্ষ্যে শিশুপালকে উপস্থিত রাজন্যগণের মধ্যে যে 'পার্থিব প্রধান বাহ্লীকরাজ দরদের' নামোল্লেখ করতে শোনা যায়, তিনিই বা কে? বাহ্লীকদেশ বা বাল্‌খ এক সময়ে ব্যাকট্রীয় গ্রীক নরপতিগণেরই অধিকারভূক্ত ছিল।

সে যা হোক, দেখা যায় কৃষ্ণের ইচ্ছায় বা কৌশলে এবং যুধিষ্ঠিরের সম্মতিতে এরপর জরাসন্ধ বধের ব্যবস্থাটাও হয়ে গেল। স্নাতক ব্রাহ্মণবেশী ভীম ও অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে গোপনে পুরীতে প্রবেশ করে ভীমকে দিয়ে মল্লযুদ্ধে বধ করা হল জরাসন্ধকে।

আরম্ভ হল এবারে দিগ্বিজয়। প্রথমেই অর্জুন শাক্যদ্বীপ ও বিন্ধ্য পর্বতের আশে পাশের রাজাদের পরাজয় ও পরে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে বৃদ্ধ যবনরাজ ভগদত্তের সাথে যুদ্ধ ও অবশেষে মিত্রতা স্থাপন করে, ক্রমে ক্রমে উত্তরাভিমুখী হয়ে প্রবেশ করলেন এসে কাশ্মীরমণ্ডলে তারপর মানস সরোবর ও উত্তর কুরু পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে সমগ্র উত্তরাঞ্চল ও সেই সাথে গন্ধর্বদেরও পরাজিত করে ফিরে এলেন ইন্দ্রপ্রস্থে বহু ধনরত্ন ও অশ্বাদি সঙ্গে নিয়ে। অর্জুনের পরে ভীমও একে একে

পূর্বদিকের রাজাদের ও সেইসঙ্গে দশার্ণাধিপতি সুধণ্বাকেও পরাজিত করে এসে পৌঁছিলেন চেদিরাজ্যে। সেখানে শিশুপালের কাছ থেকে মিত্রভাবে কর গ্রহণের পরে কোশল, অযোধ্যা, কাশী, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, ও সমুদ্রতীরের কিরাত ও ম্লেচ্ছ রাজাদের পরাজিত করে উপস্থিত হলেন মগধদেশে।

মগধে জরাসন্ধ পুত্রের সাথে মিলনের পরে, নানা দেশ থেকে আহৃত বনসম্পদ, চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য, বস্ত্রসম্ভার ও আরও সব জিনিষপত্র নিয়ে পৌঁছিলেন এসে ভীম নিজেদের রাজ্যে। এরপর সহদেব প্রথমে মথুরা হয়ে পরে মৎস্যদেশে দন্তবক্রকে জয় করে, অবন্তী ও নর্মদা পরিক্রমা-অন্তে ভোজদেশে উপস্থিত হলেন। ভোজদেশে মহারাজ ভীষ্মকের কাছ থেকে মিত্রভাবে করগ্রহণ ও তারপর আর আর রাজাদের পরাজিত করে উপস্থিত হলেন তিনি কিষ্কিন্ধ্যায় বানররাজ মৈন্দ ও দ্বিবিদের রাজ্যে। কিষ্কিন্ধ্যা জয়ের পরে মাহেশ্বতী পুরীতে প্রথমে রাজা নীলের সাথে যুদ্ধ ও পরে অগ্নির আনুকূল্যে মিত্রতা করে আসা হল সৌরাষ্ট্রে। এবারে দ্বারকায় কৃষ্ণের সাথে দেখাশুনোও পরে সাগরদ্বীপের কয়েকটি ম্লেচ্ছ রাজাদের পরাজিত করে, এই কচ্ছদেশ থেকেই [সম্ভবতঃ সমুদ্রপথে] দূত পাঠালেন সহদেব লঙ্কায় বিভীষণের কাছে। খবর পেয়েই যুধিষ্ঠিরের শাসন মেনে নিয়ে, তাঁর জন্য অনেক ধনরত্ন, অগুরু, চন্দনকাঠ ও বহুমূল্য বস্ত্রাদির উপহার পাঠিয়ে দিলেন বিভীষণ। এইভাবেই শেষ হতে দেখা যায় সহদেবের জয়যাত্রা। সবশেষে শুরু হল নকুলের যাত্রা। প্রথমেই দেখা যায় নকুলকে রোহিতক (রোটক?) দেশে মত্তময়ূরগণকে পরাজিত করতে। কে এই মত্তময়ূরগণ? দেখা যায় খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন তার নাম ছিল মৌর্যবংশ। একমতে, পিপ্পলীবনের ময়ূরপোষক গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সন্তানগণকেই মৌর্যবংশ বলা হত। এই বংশের রাজারা নিজেদেরকে 'দেবতাদের প্রিয়পাত্র' বলে অভিহিত করতেন। এরাই কি এই মত্তময়ূগণ? যাহোক, পরে নকুল শিবি, ত্রিগর্ত, মালব প্রভৃতি দেশ ও সেই সঙ্গে পুষ্করারণ্যবাসীগণ, সমুদ্রতীরবাসী আভীরগণ ও সরস্বতী নদী অঞ্চলের ধীবরগণকেও পরাজিত করেন। দ্বারকায়ও তাঁকে দূত পাঠাতে ও মাতুল শল্যকেও প্রীতিদ্বারা বশ

করতে দেখা যায়। সহদেবের মতো নকুলও 'সাগর গর্ভস্থ পরম দারুণ ম্লেচ্ছ, পহ্লব, বর্বর, কিরাত, যবন ও শকদেরও পরাজিত করেন। কথা আছে, এই দিগ্বিজয় উপলক্ষ্যে তিনি এত ধনরত্ন লাভ করেছিলেন যে, এক হাজার হাতীকেও নাকি সে সব বয়ে নিয়ে যেতে হিমশিম খেতে হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাণ্ডবদের এই দিগ্বিজয় উপলক্ষ্যে মহাভারতে যে সব রাজ্যের নামোল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে বেশ কয়েকটিকেই খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ কাশী-কোশলাদি যে-ষোড়শ মহাজনপদে বিভক্ত ছিল তাদেরই অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়। এখন কথা এই রাজসূয়-যজ্ঞ উপলক্ষ্যে সারা ভারতে যুধিষ্ঠির তথা পাণ্ডবগণের এই যে একাধিপত্য-প্রতিষ্ঠা, এর কোনরূপ ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি? অথবা একে নিতান্তই কবি কল্পনা প্রসূত বলেই মনে করতে হবে?

(৪)

যাহোক এইভাবে চারদিক থেকে প্রচুর ধনরত্ন এসে পড়ায়, সুরু হয়ে গেল যজ্ঞের কাজকর্ম। এসে উপস্থিত হলেন কৃষ্ণ, নারদ, ব্যাসদেভ আর আর বড় বড় ঋষিরা। যজ্ঞের নিমন্ত্রণ পেয়ে একে একে সমাগত হতে লাগলেন রাজারা, ব্রাহ্মণেরা, বৈশ্যরা ও 'সম্মানযোগ্য সদ্বিদ্বান' শূদ্রেরাও'। এসে পড়লেন বলরাম প্রভৃতি যাদবেরা ও তারপর পৌণ্ড্র বাসুদেব, জয়দ্রথ, শিশুপাল প্রভৃতিও এবং সেইসঙ্গে অনেক ম্লেচ্ছ ও যবন রাজারাও। এলেন ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শকুনি, বিদুর ও ভাইদের নিয়ে রাজা দুর্যোধন। কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে সভ্রাতা যুধিষ্ঠির যজ্ঞের জন্য দীক্ষা গ্রহণ করলেন। ব্যাসদেব নিজে এবং অন্যান্য ঋষিরাও ক্রমে যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত হলেন। সমাগত সকলকে যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়নের পরে, যোগ্যতা বিবেচনায় নিজের লোকদের ভার দেওয়া হল নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মের। নিজের ইচ্ছায় বেছে নিলেন কৃষ্ণ উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনের ভার। এতে করে তৎকালীন ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার প্রতি কৃষ্ণের সম্মান প্রদর্শন ও তাঁর দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া গেলেও কিন্তু কৃষ্ণচরিতকার বঙ্কিমচন্দ্রের মতে কাজটি কৃষ্ণের পক্ষে আদৌ সঙ্গত বলা চলে না এবং সেজন্য তাঁর মতে মহাভারতের সংশ্লিষ্ট উক্তিটিকে প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে করা

উচিৎ। এরপর, ভীষ্মের কথামত উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কৃষ্ণকেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানে অর্ঘ্যপ্রদান নিয়ে লেগে গেল শিশুপালের সাথে ঘোর তর্ক বিতর্ক। কোন দিক থেকেই শিশুপাল কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে রাজী না হওয়ায়, বরং প্রথম জীবনে পুতনা ও বৎসাসুর বধের জন্য তাঁকে স্ত্রী ও গোধন হত্যাকারী এবং পরে অন্যায়ভাবে জরাসন্ধকে বধ করার জন্য তাঁকেই দায়ী বলে জোর করতে থাকায় - সর্বোপরি ভীষ্মের কৃষ্ণপ্রীতির প্রতি তাঁর তীব্র শ্লেষ বাক্যে, তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হল। ভীষ্মের নিজের কথা ছেড়ে দিয়ে, ভীম, সহদেব, এমনকি দেবর্ষি নারদকে পর্যন্তও তীব্র ভাষায় শিশুপালকে নিন্দা করতে শোনা গেল। যাহোক, শেষ পর্যন্ত ভীষ্মের কথায় উত্তেজিত হয়ে উঠে শিশুপাল কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করতেই, সুদর্শনচক্রের আঘাতে কৃষ্ণ তাঁর শিরচ্ছেদ করে ফেললেন। এই শিশুপালবধের ব্যাপারে ঘটতে দেখা যায় এক অলৌকিক কাণ্ড। যেমন করে বৃন্দাবন লীলায় অঘাসুরবধের পরে তার দেহনির্গত জ্যোতি কৃষ্ণ শরীরে প্রবিষ্ট হয়েছিল, এখানেও এরপর যা বলা হয়েছে তাতে ঠিক তেমনি ভাবেই 'তাহার (শিশুপালের) কলেবর হইতে গগনচ্যুত সূর্যের ন্যায় সুমহৎ তেজঃপূঞ্জ সমুত্থিত হইয়া সর্ব্বলোকনমস্কৃত কমললোচন কৃষ্ণকে অভিবাদন পূর্বক তদীয় শরীরে লীন হইল'। বলাবাহুল্য, এদ্বারা এখানে কৃষ্ণের অবতারত্ব সপ্রমাণেরই চেষ্টা করা হয়ে থাকলেও সেইসঙ্গে জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের একাত্মতার কথাটাও আনুষঙ্গিকভাবে এসে পড়তে দেখা যায়। সে যাই হোক, শিশুপালবধের পরে যজ্ঞসমাপনের কোন আর বাধা থাকল না। যজ্ঞ শেষে ফিরে গেলেন যে যার নিজের জায়গায়। যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে ফিরে গেলেন কৃষ্ণ দ্বারকায়। শিষ্যদের নিয়ে রওনা দিলেন ব্যাসদেবও কৈলাস পর্বতোদ্দেশে।

ওদিকে যাঁর ইচ্ছায় এই রাজসূয় যজ্ঞ, যজ্ঞশেষে সেই পাণ্ডব প্রধান ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিজের অবস্থাটা কী দাঁড়িয়েছিল? নারদের কথা স্মরণ করে ভেবেছিলেন যুধিষ্ঠির - এইভাবে শিশুপালবধেই বুঝিবা নারদের ভবিষ্যদ্‌বাণীর চরম পরিণতি ঘটে গেল। কিন্তু না, এ ব্যাপারে ব্যাসদেবের যে উক্তি তা থেকে মরণ বরণ করেই বুঝে নিতে হয়েছিল তাঁকে - এখন থেকে ঠিক তের বছর পরে যে মহা অনর্থ ঘটবে,

এ কেবল তারই পূর্বাভাস মাত্র। বস্তুতঃ এ বিষয়ে নারদ অথবা ব্যাসদেবের ভবিষ্যদ্ বাণী যে কতদূর সত্য, যজ্ঞ শেষ হতে না হতেই তার প্রমাণও পাওয়া গিয়েছিল যখন পাণ্ডবদের অতুল ঐশ্বর্য দর্শনে ঈর্ষান্বিত দুর্যোধন সভাগৃহের অদ্ভুত কারুকার্যের ফলে কখনও স্থলকে জল, আবার কখনো বা জলকেই স্থল বলে ভুল করে, সকলের কাছেই হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছিলেন ও তারপর প্রতিশোধের বাসনায় শকুনির পরামর্শে মতলব আঁটতে সুরু করে দিয়েছিলেন কপট পাশাখেলার।

শ্রীচৈতন্য ও ধর্মসমন্বয়

ডাঃ রুহিদাস সাহা

শ্রীচৈতন্য ভক্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেছেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই তাঁর উপাস্য। তা হলেও তিনি নির্বিচারে সকল মন্দিরেই গিয়েছেন, মন্দিরের বিগ্রহের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণকালে মল্লিকার্জুন তীর্থে মহেশ্বর, দাসরাম মহাদেব-স্থানে মহাদেব, অহোবিলাম নৃসিংহ স্থানে নৃসিংহ, সিদ্ধবটে সীতাপতি রঘুনাথ, স্কন্দ ক্ষেত্রে কার্ত্তিকেয় দর্শন করেছেন। "বৃদ্ধ কাশী আসি কৈলা শিব দরশন।" বেঙ্কট অঞ্চলে চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্তি, ত্রিপদীতে শ্রীরাম দর্শন করলেন শ্রীচৈতন্য – "রঘুনাথ আগে কৈল প্রণাম-স্তবন"। পানা নরসিংহে এসে শ্রীচৈতন্য "নৃসিংহে প্রণতি স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল"। তারপর "শিবকাঞ্চী আসি কৈল শিব দরশন"। বিষ্ণুকাঞ্চী এসে তিনি লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন করেছেন এবং "প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন।" শ্রীচৈতন্য ত্রিকাল হস্তিস্থানে "মহাদেব দেখি তাঁরে করিলা প্রণাম"। পঞ্চতীর্থে গিয়ে তিনি "কৈল শিবদরশন"। শ্বেতবরাহ দর্শন করেছেন তিনি বৃদ্ধ কোল তীর্থে। একে একে দর্শন করলেন তিনি পীতাম্বর শিবস্থানে শিব, শিয়ালী ভৈরবী দেবীস্থানে শিয়ালী ভৈরবী, কাবেরী তীরে গোসমাজ শিব। শ্রীচৈতন্য বেদাবনে "মহাদেব দেখি তাঁর করিলা বন্দন"। তারপর দর্শন করেছেন তিনি অমৃত লিঙ্গ শিব। ক্রমে ক্রমে শ্রীচৈতন্য দর্শন করলেন শিবক্ষেত্রে শিব, শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বর্ত্তমান

শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথ, ঋষভ পর্বতে নারায়ণ, শ্রীশৈলে শিবদুর্গা, চিড়িয়াতালা তীর্থে শ্রীরাম লক্ষ্মণ, তিলকাঞ্চিতে শিব, পানাগড়ি তীর্থে সীতাপতি, চামতাপুরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ, মল্লার দেশে তমাল কার্ত্তিক, শংকরাচার্যের সিঙ্ঘারি মঠ, কলাপুরে লাঙ্গা গণেশ, চোরা ভাগবতী স্থানে চোরা ভাগবতী, পাণ্ডুপুরে বিঠ্ঠল ঠাকুর।

কাশীতে শ্রীচৈতন্য বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দর্শন করেছেন। প্রয়াগ, মথুরা,বৃন্দাবনেও তিনি বহু তীর্থ ভ্রমণ করেছেন। পুরী যাত্রা পথে শ্রীচৈতন্য যাজপুরে বিরজাদেবী দর্শন করেছিলেন বলে মুরারী গুপ্ত তাঁর কড়চায় লিখেছেন।

শ্রীচৈতন্যের পুরী যাত্রা পথে যাজপুরে বিরজাদেবী দর্শন করলেও পঞ্চ ‘ম’-কারে ভবানী পূজার বিরোধী ছিলেন তিনি। তবে ভক্তিতে সদাচারে শক্তিপূজার বিরোধী তিনি ছিলেন না। পুরী যাত্রার পথে এক শাক্ত অবধূত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তার জন্যেও শ্রীচৈতন্যের স্বাভাবিক প্রীতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। অবশ্য এরূপ মধুর আচরণই শ্রীচৈতন্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কারণ তিনি নির্বিচারে মানুষকে ভালবেসেছেন।

শ্রীচৈতন্য ধর্ম বিষয়ে উদার ছিলেন। নারী জাতিকে তিনি পুরুষের মতই মর্য্যাদা দিয়েছেন। শালগ্রাম শিলা পূজায় একমাত্র ব্রাহ্মণের অধিকার ছিল। সেই অধিকার দিয়েছেন তিনি শূদ্র ও স্ত্রীজাতিকে। উপাসনা বিষয়ে তিনি কেমন উদার ছিলেন তার এক উদাহরণ মুরারি গুপ্ত। মুরারি ছিলেন রামচন্দ্রের উপাসক। শ্রীচৈতন্য তাঁকে একদিন কৃষ্ণ ভজন করতে বললেন। মুরারি সম্মত হলেন না। বললেন – “তা আমি পারব না প্রভু। রামচন্দ্রের চরণ আমি ছাড়তে পারব না”। মুরারির কথায় অত্যন্ত আনন্দিত হলেন গৌরাঙ্গ। তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, “তোমার ইষ্ট-নিষ্ঠা প্রশংসনীয়। তুমি সাক্ষাৎ হনুমান। তুমি কেন রঘুনাথের চরণ ত্যাগ করবে? তোমার ইষ্ট-নিষ্ঠা প্রকাশ করার জন্যই আমি তোমাকে কৃষ্ণ-ভজনে প্রলুব্ধ করেছিলাম।”

শ্রীচৈতন্য শেষ আঠারো বছর পুরীতেই ছিলেন। এই সময় তিনি জগন্নাথদেবকে দর্শন করতেন তন্ময় হয়ে। জগন্নাথদেবের জন্য তাঁর সীমাহীন ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় ধর্ম্মীয় গোঁড়ামি তাঁর ছিল না।

শ্রীচৈতন্যের এই অসাম্প্রদায়িক মনোভাব হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কেও তাঁর মনোভাব একই রকম উদার। শ্রীচৈতন্য বিহারে এক জৈন মন্দিরে তিন দিন অবস্থান করেছিলেন। দক্ষিণ ভারত পর্য্যটন কালে মৌর্য্য-রাজত্বকালের বিখ্যাত জৈন তীর্থ সিদ্ধকূটেও তিনি গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তিনজন তীর্থংকর নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ, ও মহাবীরের মন্দিরে প্রবেশ করে প্রতিটি বিগ্রহের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারত পর্য্যটনকালে ব্রহ্মগিরি পর্বতে উঠতেই সেখানে দেখলেন নাথ-সম্প্রদায়ের গুরু গোরখনাথের তপস্যা ক্ষেত্র। এখানে প্রতিষ্ঠিত গোরক্ষনাথ –বিগ্রহকে শ্রদ্ধা জানালেন শ্রীচৈতন্য। দক্ষিণ ভারত পর্য্যটন কালে স্বেচ্ছায়ই তিনি বৌদ্ধ আচার্য্যদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য যে মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরাণ পাঠ করেছিলেন তার প্রমাণ চাঁদ কাজী ও বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তন কালে এক পাঠান পীরের সঙ্গে তত্ত্ববিচার। পাঠান পীরের সঙ্গে তত্ত্ব-বিচারে মুসলমান ধর্মগ্রন্থ কোরাণকে ভিত্তি করেই শ্রীচৈতন্য সবিশেষ ব্রহ্মবাদ স্থাপন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য যুক্তি দিয়ে মুসলমান ধর্মগ্রন্থ কোরাণ সম্পর্কে প্রচলিত ব্যাখ্যা খণ্ডন করেছিলেন, কোরাণকে খণ্ডন করেন নি। বরং শ্রীচৈতন্য কোরাণকে বেদের সম্মান দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যের নির্দ্দেশে লিখিত ‘হরিভক্তি বিলাস’-এ বুদ্ধকে অবতারের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যের উদার মনোভাবের প্রতিফলন হয়েছে ঠাকুর হরিদাসের একটি উক্তিতে। মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও হরিদাস হরিনাম করায় কাজীর বিচারে তাঁকে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। সেই অমানুষিক নির্য্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত দেহের নিদারুণ যন্ত্রণার মাঝেও হরিদাস বলেছিলেন, “সর্বলোক সেই ঈশ্বর-সন্তান। অজ্ঞ নরে ভেদ করে হিন্দু-মুসলমান।”

কারও কারও মতে শ্রীচৈতন্য মূর্তি-পূজায় প্রাধান্য দেন নি আর সেই কারণেও তাঁর ধর্মে একটি সমন্বয়ী সুর বিদ্যমান। এটা তো ঠিকই, তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন নাম-সংকীর্তনে।

শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত ধর্মে ভগবান সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, - যে কোন পথেই সেই সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহের সঙ্গে একটা প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরই নাম প্রেম-ভক্তি। এই প্রেম-ভক্তি মানুষের হৃদয়ের এক স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি সর্বকালে সর্বদেশে। সেই সঙ্গে রসতত্ত্ব আস্বাদনে মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধদের ধর্মীয় সংস্কারে আঘাত লাগেনি। তার উপর শ্রীচৈতন্যের প্রেমাশ্রু ও ভাবের ঐশ্বর্য্য দর্শনে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ শ্রীচৈতন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করেছেন। এমনকি নিজ ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে থেকেও শ্রীচৈতন্যকে আরাধ্য দেবতা জ্ঞানে পূজা করতে অসুবিধা হয়নি তাদের।

ওড়িষ্যায় বৌদ্ধদের পঁচজন প্রধান 'পঞ্চ সঙ্গ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে শ্রদ্ধার আসন করে নিয়েছিলেন। এঁরা হলেন – জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ, অনন্ত ও যশোবন্ত দাস। এঁরা শ্রীচৈতন্যের সান্নিধ্যে এসে শ্রীচৈতন্যের কৃপা লাভ করেছেন এবং পরবর্ত্তীকালে এঁরা বুদ্ধের অবতার জ্ঞানে শ্রীচৈতন্যকে পূজা করেছেন। এঁরা শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে গ্রন্থও রচনা করেছেন। পঞ্চসঙ্গর অন্যতম অচ্যুতানন্দ ওড়িয়া ভাষায় তাঁর রচিত গ্রন্থ 'শূন্য সংহিতায়' শ্রীচৈতন্যের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। ওড়িষ্যার এক বৌদ্ধ শ্রীচৈতন্য ভক্ত 'শ্রীচৈতন্য সার্বভৌম সংবাদ' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ওড়িষ্যার ঈশ্বর দাস তাঁর রচিত 'চৈতন্য ভাগবত'-এ শ্রীচৈতন্যকে সর্বত্র বুদ্ধ অবতার রূপে বন্দনা করেছেন। আবার জগন্নাথদেবই যে শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন সে কথাও তাতে বলা হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, মানবজাতির জন্য তাঁর অসীম ভালবাসা, আর তাঁর প্রচারিত ধর্মে উদার মতবাদ আকৃষ্ট করেছে জাতি ধর্ম বর্ণ

নির্বিশেষে অনেককেই। মুসলমান ঘরে জন্মগ্রহণ করলেও হরিদাস তাঁর এমনই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত যে তিনি তাঁর মরদেহ নিজের হাতেই সমুদ্র তীরে সমাধিস্থ করেছিলেন। চাঁদ কাজীও শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। চাঁদ কাজীর সমাধি ক্ষেত্র ভক্তজনের কাছে পবিত্রস্থান। তাইতো তারা সেখানে শ্রদ্ধা জানায়। এই উদারতার প্রস্রবন শ্রীচৈতন্য, সেই উদারতা ভক্তদের মধ্যে প্রবহমান। শ্রীচৈতন্যের ভক্তের জাতি নেই, বর্ণ নেই, দেশ নেই। শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত 'মানবধর্ম' অনুসারে তাঁদের একমাত্র পরিচয় তারা মানুষ। শ্রীচৈতন্যের ধর্মে ধর্মে-ধর্মে বিরোধের কথা নেই, আছে সমন্বয়ের কথা। ব্যবধান নেই, আছে একতা। তাঁর প্রচারিত নগর-সংকীর্ত্তনই তার এক সার্থকরূপ।

শ্রীচৈতন্য প্রেমের প্রস্রবন, মানবতার মহাসমুদ্র, ধর্ম-সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক।

ভোপাল থেকে একটু দূরে – সাঁচী ও ভীমবেটকা — শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য

আমাদের মাথায় ছিল সাঁচী আর ভীমবেটকা, অপরপক্ষে পার্থ আর স্থিরার হৃদয়ে ওঙ্কারেশ্বর আর মহেশ্বর। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম মহাকালেশ্বর সহ উজ্জয়িনী অবশ্য সবার ভাবনাতেই ছিল আর যাতায়াতের দুটি ট্রেনই যখন শিপ্রা এক্সপ্রেস (২২৯১২ এবং ২২৯১১) তাই ইন্দোরটাও হিসেবে এসে যায়। চারমাথা এক হওয়ার পর স্থিরা যে আইটিনেরারি বানালো তাতে সবাইকে খুশি করার পর মাড়ুও দিব্য খাপ খেয়ে গেল। অতএব গত ২২শে ফেব্রুয়ারী বিকেল ৫.৪৫ এ হাওড়ার ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে শিপ্রা এক্সপ্রেস ছাড়তেই চারবার্থের কূপে শুরু হয়ে গেল ভীমবেটকা আর সাঁচী চর্চা। ভ্রমণ সূচীর প্রথম দিনটাতো ঐ দুই স্থানকেই কেন্দ্র করে। ২৩ তারিখে সন্ধ্যা সাতটা তিরিশে সন্ত হিরদারাম নগর (পূর্বতন নাম বৈরাগড়) পৌঁছবার কথা থাকলেও চলার ছন্দে তাল কেটে শিপ্রা সেখানে পৌঁছাল

৮.২০তে। আমাদের হোটেল নীনা প্যালেস স্টেশন থেকে বেশি দূরে নয় তাই রক্ষে কারণ আগামীকাল সকাল থেকে আটদিনের ছুটোছুটির আগে রাতের বিশ্রামটা ছিল ভীষণ জরুরী। প্রসঙ্গতঃ আমাদের দেখার পালা এবার শেষ হবে ২রা মার্চ, যেদিন রাত ১১.৩০ এর শিপ্রাতেই আমরা কলকাতা ফিরব।

২৪ তারিখের সাতসকালেই লালঘাটির বাসস্ট্যান্ডে ছুটেছিলাম সারাদিনের ভ্রমণ সহায়ক একটা ফাইভ সিটার ঠিক করতে। মনোজের সুইফ্ট ডিজায়ারটা সেদিক থেকে আইডিয়াল। সারাদিনে সাঁচী-ভীমবেটকা সহ যথা ইচ্ছা তথা যাওয়ার ভাড়া সামান্য দরাদরিতেই নেমে এল ২৬০০ তে! কথাবার্তা পাকা করে হোটেলে ফিরে কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট শেষ হতে না হতেই ৭৪১৫০৪৮৭৯২ থেকে ফোন। বুঝলাম দুয়ারে ভীমবেটকা। ফিতে কাটা অবশ্য হয়ে গেল আপার লেকের পাড়ে। চলার পথে এমন হ্রদকে পাশ কাটাতে মনোজের মন চায়নি, আর আমরা আগামী কালের ভোপাল দর্শনে আপার লেক থেকে লোয়ার লেক সব কিছু থাকবে জেনেও সুন্দরকে আগে একবার পেয়ে যেতে দ্বিধা করিনি। আপার লেক আসলে ভোজতাল, শহরের পূর্বে, আর পশ্চিমে আছে লোয়ার লেক যা ছোটা তালাও নামে পরিচিত। ৩১.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ আর ৫ কিলোমিটার প্রস্থের এই হ্রদ কোলান্স নদী থেকে সৃষ্ট হয়ে শহরের পানীয় জলের প্রধান উৎসই শুধু হয়ে ওঠেনি, বিপুল বিস্তার আর নৌবিহারের সুযোগ তাকে ভোপাল পর্যটন মানচিত্রে অন্যতম সেরার আসনে বসিয়ে দিয়েছে। স্থানীয় লোক কাহিনী অনুসারে পারমার রাজা ভোজ (১০০৫- ১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) তার রাজ্যের পূর্বসীমা রক্ষা করতে এই তালাও প্রস্তুত করান। মতান্তরে চর্মরোগ থেকে মুক্তিলাভের লক্ষ্যে এক সাধুর পরামর্শে বেতোয়া সহ ৩৬৫ টি উপনদীকে একত্রিত করে তৈরী করা হয় ভোজতাল। হ্রদের এক কোণের স্তম্ভে তলোয়ার হাতে ভোজরাজার বিশাল মূর্তি দেখে এবার এগিয়ে চলি আমাদের পথে। উদ্দেশ্য ভীমবেটকা থাকলেও পথে যখন উত্তরভারতের সোমনাথ বলে খ্যাত ১১শতকের ভোজেশ্বর শিবমন্দির তখন তো সেখানে একবার যেতেই হয়। ৩২.২৫ x ২৩.৫ মিটারের কারুকার্যময় লাল বেলে পাথরের মন্দির দেখতে সামান্য চড়াই

ভাঙ্গতে হলেও যখন শুনবেন ২.৩৫ মিটার উচ্চ আর ৬মিটার ব্যাসের একখণ্ড পাথর কুঁদে তৈরী হওয়া শিবলিঙ্গটিই ভারতের বৃহত্তম তখন অবাক বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে শিবের বিশালত্ব মাপতে ভুলে যেতে পারেন। শুনেছিলাম এই অঞ্চলেই নাকি একাদশ শতাব্দীতে সাতশো বর্গকিলোমিটার ব্যাপ্ত এশিয়ার বৃহত্তম লেকটি কেটে ছিলেন ভোজরাজ। ভোজেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে সে লেক খুঁজতে গিয়ে অবশ্য বেকুব বনেছি। ১৪৩০ সালে মালোয়ার স্বার্থে বেতোয়ার জলে তৈরী হওয়া লেকের বাঁধ কেটে যে তাকে ধ্বংস করেন মান্ডুর দ্বিতীয় সুলতান হোসাংশাহ, তা আর জানব কিভাবে? জনশ্রুতি তিনমাস ধরে বাঁধ কাটে এক সৈনিক, তারপর জল সরতেও লেগে যায় প্রায় তিন বছর। শেষ পর্যন্ত তিরিশ বছরে জল শুকিয়ে আজ তা ৩৮৪ গ্রামের জন্মভূমি।

ভোজেশ্বর থেকে ভীমবেটকা প্রায় ২৮ কিলোমিটার হলেও বেশ কিছুটা আগে থেকেই দেখা যায় বিন্ধ্যপর্বতের দুরারোহ অধিত্যকায় ২২০০ ফুট উঁচুতে সারি দেওয়া প্রাচীন গুহার আভাস। ১০,০০০ বছর আগেকার মানুষের অঙ্কনশৈলী দেখার উত্তেজনায় ভরপুর হয়ে পৌঁছে যাই প্রবেশদ্বারের টিকিট কাউন্টারে। গাড়িসমেত ড্রাইভার ও আমাদের জন্য ১৫০টাকা প্রবেশ মূল্য দিলে মোবাইলে ফটো তোলার ঢালাও অনুমতি। ১৯৫৭ সালে বিষ্ণু শ্রীধর ওয়াকাঙ্কার-এর আবিষ্কার পাথর কেটে তিন ধাপে প্রায় ৭৫০ গুহায় ভারতের প্রাচীনতম মানব ইতিহাসের এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। তারপর ১৯৭১-৭৭ সালের খননের পর পুরাতাত্ত্বিকদের রায়ে বিশ্বে আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক গুহার অন্যতম বলে বিবেচিত ভীমবেটকা তো ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট রূপেও স্বীকৃতি পেয়ে গেছে ২০০৩ সালে। এর মধ্যে উপর ধাপের গুহাগুলি যেমন আকারে বড় তেমনি অলংকৃত সুন্দর সব ছবিতে। বিষয় বৈচিত্র্য ও অঙ্কনশৈলীর তারতম্যে পুরাতন ও নতুন প্রস্তর মিলিয়ে অন্তত সাতযুগের কীর্তি এখানে স্থান পেয়েছে, এর মধ্যে লৌহ যুগের ছবির আধিক্যই বেশি। গুহার সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে তবে দর্শকদের জন্য বর্তমানে উন্মুক্ত ১৫টি। ভিউ পয়েন্ট রয়েছে আট নম্বর গুহার কাছে, যদিও পাথর টপকে সেখান থেকে কোন আহামরি

দৃশ্য মেলেনা। তবে মোটের ওপর ভীমবেটকার প্রকৃতি সুন্দর। পাথরের বুকে রয়েছে বারোমেসে ঝরনা। প্রবাদ বনবাসকালে পাণ্ডবদের আগমন ঘটেছিল এখানকার কোন এক গুহায়। ভীমের আসন অর্থাৎ বৈঠক থেকে নাকি নাম হয়েছে ভীমবেটকা। প্রকৃতি যেমনই হোক, অরণ্যচরের যাতায়াত রয়েছে এখানকার পাহাড় আর জঙ্গলে। তাই দিনমানেই বিন্ধ্য, বেতোয়া আর গুহামানবের সাহচর্য ছেড়ে এগিয়ে চলি ২৭০০ বছর আগেকার হীনযান বৌদ্ধতীর্থ সাঁচীর উদ্দেশ্যে। চলার পথে আরেক রোমাঞ্চ, ভারতের ঠিক মধ্যবিন্দুতে 'Tropic of Cancer.' গুজরাট, রাজস্থান, ছত্রিশগড়, পশ্চিমবঙ্গ সহ আটটি রাজ্যের ওপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা চলেছে সত্যি কিন্তু ভারতের মধ্যবিন্দুতে তাকে পেলে শিহরণের সাথে অন্তত মিনিট দশেকের একটা ফটো সেশন থাকবেই।

এরপর মনোজ যেখানে গাড়ি থামালো সেটাই সাঁচীর টিকিট কাউন্টার। জনপ্রতি পাঁচ টাকার টিকিটে যে পুরাতত্ত্ব সংগ্রহালয়ের প্রবেশপত্র তার প্রবেশ দ্বার টিকিট কাউন্টারের পাশেই আর সাঁচীর বিখ্যাত স্তূপ দেখতে জনপ্রতি চল্লিশ টাকার টিকিট নিয়ে ভাঙ্গতে হবে বিন্ধ্যপর্বত অধিত্যকার ৯১ মিটার উঁচু মোটরেবল পথ। মোবাইলে ফটো তুলতে আলাদা কোন খরচ নেই, তাই মনোজের গাড়ি স্তূপের পার্কিং এরিয়ায় থামতেই সকলের মোবাইল সক্রিয় হয়ে ওঠে। সাঁচীর মূল আকর্ষণ মহান বা সর্ববৃহৎ স্তূপ (স্তূপ নাম্বার ওয়ান)। টিকিট দেখিয়ে স্তূপের প্রাঙ্গণে ঢুকেই চোখে পড়ে ১৬.৪ মিটার উঁচু আর ৩৬.৫ মিটার ব্যাসের গোলার্ধাকৃতি সেই স্তূপ যা কিনা মৌর্য সম্রাট অশোকের হাতে শুরু হয়ে শেষ হয় খ্রীষ্টপূর্ব তিন থেকে দুই শতকে তার উত্তর পুরুষের হাতে। প্রসঙ্গত খ্রীষ্টপূর্ব ছয় শতকে বুদ্ধের পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে তার দেহাবশেষের স্মারক রূপে ভারত জুড়ে ৮৪,০০০ স্তূপ গড়েন সম্রাট অশোক। আটটি তার সাঁচীতে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তিনটি স্তূপ এখনও বর্তমান সাঁচীর এই বিশাল পাথরের রেলিং দিয়ে ঘেরা ইতিহাসের গন্ধ পাওয়া প্রাঙ্গণে। বৃহৎ স্তুপের পশ্চিমে পাহাড়ের ঢালে সহজ সরল অনাড়ম্বর সাত মিটার উঁচু খ্রীষ্টপূর্ব দুই শতকের স্তুপ নাম্বার টু যেন একা একাই

পর্যটকের আশায় প্রহর গুণছে। কাছেই রয়েছে ১৯৫২ তে সিংহল বৌদ্ধ সমাজের গড়া সারনাথের আদলে বিহার, আর ১৯৮৭ তে বুদ্ধগয়া থেকে আনা বোধিবৃক্ষ। মহান স্তূপের চারপাশে আরো যে সব ধংসাবশেষ, তার কোনটা ছিল প্রাচীন মন্দির কোনটা বা চার শতকের গুপ্তযুগের গুপ্ত মন্দির। বুদ্ধের কেশ, নখ, অস্থি কোন পুণ্যাধারে রেখে ঢিপির মত মঠ ও গড়েছে ভক্তের দল। তবে এসবই আজ বিধ্বস্ত। শুধু স্বমহিমায় দর্শকের চোখ টানছে বৃহৎ স্তূপ - তাকে ঘেরা ৮.৪ মিটার উঁচু চারটি তোরণে বুদ্ধের জন্ম, আলোকপ্রাপ্তি, ধর্মোপদেশ জাতক কাহিনী ও নির্বাণলাভের ছবি সঙ্গে নিয়ে। বৃহৎ স্তূপের উত্তর-পূর্বে ১৫ মিটার উঁচু নিউবিহার অর্থাৎ স্তূপ নাম্বার থ্রি দেখে মহল থেকে নেমে আসুন পাহাড়ের পাদদেশে। এখানেই তো সেই গুপ্তযুগ থেকে চতুর্থ শতকের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সংগ্রহ নিয়ে গড়ে ওঠা প্রত্নতাত্ত্বিক মিউজিয়াম। মিউজিয়ামের প্রধান হলে রয়েছে অশোক স্তম্ভ আর বাকি চারটি গ্যালারিতে কুবের, বিষ্ণু, নৃত্যরতা নারী, মাতৃস্নেহ সহ বেশ কিছু পাথরের আস্ত এবং আধভাঙ্গা মূর্তি। রয়েছে সেকালে ব্যবহৃত লোহার জিনিষপত্র আর ইংরেজ আমলের স্যার জন মার্শালের ব্যবহৃত সিলভার কাটলারি। ছবির ঘরে অবাক হই ১৯১২ সালে সাঁচী কেমন ছিল তা দেখতে পেয়ে। বিস্ময় গভীরতর হয় যখন জানি ফা-হিয়েন অথবা হিউয়েন সাঙের ভারত বৃত্তান্তে অনুল্লিখিত সাঁচীতে কখনো বুদ্ধদেবের আগমন ঘটেনি।

ফিরতিপথে মনোজের একটা মরিয়া চেষ্টা ছিল যাতে আমরা মহাবীর গিরির শ্বেতাম্বর জৈন মন্দির প্রাঙ্গন থেকে ভোজতালের বুকে সূর্যের ডুবে যাওয়া দেখতে পারি, কিন্তু অফিস ফেরতা ট্রাফিকের স্রোত তো তার আগে আমাদের ভোপালে ঢুকতেই দিল না। অবশ্য রয়েছে আগামী কালের আশ্বাস। ভোপাল সাইট সিয়িং-এর শেষ পর্বে তো কাল আমরা পাহাড়ের মাথায় উঠতেই পারি।

DO NOT COPY

আপার লেক, ভূপাল

ভীমবেটকার গুহা

ভোজেশ্বর শিব

সাঁচী স্তূপ নং ৩

মহান স্তূপ (স্তূপ নং ১)

কর্কটক্রান্তি রেখার কল্পিত অবস্থান

s s

বিকিরণের পরে

শ্রী সুনন্দন ঘোষ

একটা বিস্ফোরণ --
নিভে যাওয়া অনেক প্রাণ, পঙ্গুত্বের হাহাকার,
ক্ষীণ হয়ে আসা ভাবী জীবনের সংকেত।
সময়ের সাথে অমৃতধারায় ধুয়ে গেল বিকিরণের তেজ।
মুছে গেল মৃত্যুর অঙ্ক।
তেজস্ক্রিয় চেরনোবিলে এখন সবুজ গাছের জঙ্গল,
উদ্বর্তিত প্রাণের আশ্রয়।

থামতে দেয় না প্রকৃতি ...
মহান সভ্যতায় এখন বাড়ি, বালি, জরু, গরু,
চাকরি, শিক্ষা, সৌজন্য – সব চুরি হয়,
আঘাতের পরেও সন্ন্যাসীরা নামেন সমাজত্রাণে,
প্রবঞ্চিত প্রজন্ম রাবণের মৃত্যুবাণ নিয়ে বসে থাকে
মাতঙ্গিনীর পায়ের কাছে --- গ্রীষ্ম বর্ষা শীত উপেক্ষা করে।

বিকিরণের শেষে শ্যামলিমা হাত বাড়াবে আবার,
সৃষ্টি ফেরাবে রূপান্তরিত প্রাণ,
কৌরবের শাসন ছেদ করে ফিরবে পাণ্ডবেরা
হস্তিনাপুরের সিংহাসনে।

DO NOT COPY